বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা: ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা

মো. জাহাঙ্গীর আলম

পানি ব্যবস্থাপনার ওপর ফসলের উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় এবং কৃষক আর কৃষি অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি মৌলিকভাবে নির্ভরশীল। সমগ্র বাংলাদেশ তো বটেই, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি সম্পদের অব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং নদী বা খালের তলদেশ ভরাটজনিত সংকট। কৃষক এবং কৃষি পড়েছে হুমকির মুখে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি এবং পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভবদহের জলাবদ্ধতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এই প্রবন্ধে কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার সাথে অর্থনীতি ও নীতিনৈতিকতার দিকটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. ভবদহের পরিচিতি : ভবদহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি জলাবদ্ধ এলাকার নাম। গাঙ্গেয় প্লাবন দ্বারা গঠিত, অপেক্ষাকৃত নবীন এবং নদীবিধৌত এলাকা। প্রকৃত অর্থে যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরার সংযোগস্থল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। ভবদহ স্লুইস গেট সংশ্লিষ্ট যশোরের অভয়নগর, মণিরামপুর, কেশবপুর, খুলনার ফুলতলা, ডুমুরিয়া, সাতক্ষীরার তালাকেন্দ্রিক এর ব্যাপ্তি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে এলাকার নদীসমূহের প্রবল গতিযুক্ত প্রবাহ ছিল। উজানের নদীসমূহের সাথে অবাধ সংযোগ ছিল বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। অসুবিধা ছিল দিনে দুইবার জোয়ারের লবণাক্ত পানি আর বন্যা। ওই সময় পলি প্লাবন ভূমিতে পড়ে ভূমি গঠনের কাজ এবং নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ন ছিল। ভূমি গঠন শেষ হওয়ার পূর্বেই উপকূলীয় বাঁধ তৈরি হয় (গত শতাব্দীর ষাটের দশকে) এবং উজানের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষভাবে ২৭টি বিল এবং পরোক্ষভাবে আরো ২৬টি বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য ১৯৬১ সালে ভবদহ স্লুইস গেটের জন্ম। প্রথমত স্লুইস গেটের সুফল লক্ষণীয়। কিন্তু পলি জমে ধীরে ধীরে ভরাট হতে থাকে নদীর তলদেশ। গত শতাব্দীর আশির দশকে দৃশ্যমান হয় জলাবদ্ধতা, এখন তার ভয়াবহ পরিণতি। মূলত ২৩টি ইউনিয়নের ২১৮টি গ্রাম এবং ৩৩০ বর্গকিলোমিটার ভবদহের সংশ্লিষ্ট এলাকা বলা যায়। এই জলাবদ্ধতার কারণে বলা হচ্ছে ভবদহের বাঁধ মানুষের মরণফাঁদ। সমাধানের জন্য মুক্তির লড়াই হয়েছে। উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভুক্তভোগী জনতা এবং সরকার। স্থায়ী সমাধান হয়নি।

২. পটভূমি : খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, জেলা নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গঠিত। নদীসমূহের পলিবাহিত জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা এবং স্বাদু পানি সমন্বিত এ অঞ্চল পৃথিবীর উর্বরতম অঞ্চল হিসেবে খ্যাত। ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতের গঙ্গা, সেদেশের নদীয়া জেলার করিমপুর হয়ে বাংলাদেশের মেহেরপুরে প্রবেশ করে। গতিপথে মেহেরপুরের শোলমারী থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে প্রবহমান। চলমান ধারায় পদ্মার শাখা ভৈরব–মাথাভাঙা, মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রীহরি, তেলিগাতী নদী, গ্যাংরাইল ও শিবসা হয়ে কাঙ্গার সাথে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এখানে দুটো বিষয় জানা দরকার–এক. গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগরের এই ধারা একসময় বাধাহীন ছিল, জলাবদ্ধতা ছিল না। দুই. এই ধারার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় (যা পরের আলোচনায় সন্নিবেশিত) মুক্তেশ্বরী–টেকা-শ্রীহরি নদীর সংশ্লিষ্ট এলাকাই বর্তমানে সমস্যাগ্রস্ত ভবদহের জলাবদ্ধ অঞ্চল। মূলত ষাটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরামর্শ-উদ্বুদ্ধ সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির আওতায় অধিক ফসল ফলানোর কৌশলের অংশ হিসেবে ইউএসএআইডির সহায়তায় এবং এডিবির ঋণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ৩৯টি পোল্ডার, ১৫৬৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ এবং ২৮২টি স্লুইস গেট দিয়ে ফসলের প্রলোভনে এ অঞ্চলের মানুষ ও তার প্রকৃতি পরিবেশকে দীর্ঘমেয়াদি সংকটের যাঁতাকলে ফেলে দেয়া হয়। অবশ্য উপকূল রক্ষা বাঁধ দেয়ার উষালগ্নে কয়েক বছর বাম্পার ফলন হয়। স্থানীয় কৃষকদের ভাষ্য মতে এজন্য তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে সোনার কাঁচি উপহার দিয়েছিল। এরই মধ্যে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। বাঁধ দেয়ার ফলে পলি অবক্ষেপণের প্লাবন ভূমি আটকা পড়ল, ভূমি গঠন বাধাগ্রস্ত হলো। একদিকে কৃষিজমি হারাতে থাকল পলি, অন্যদিকে জোয়ারে আসা এই পলি নদীতীর এবং তলদেশে জমা হতে থাকল। ফলে নদীর বুক উঁচু এবং বিলের তলদেশ সে তুলনায় নিচু থেকে গেল। বিলসমূহ পরিণত হলো পানির পকেটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর আশির দশকে, মূলত ১৯৮২ সাল নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আড়াই লাখ হেক্টর কৃষিজমি স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতার রূপ নেয়। ভবদহ অঞ্চলের ২৭টির বেশি বিল এবং প্রায় ১০ লাখ মানুষ পড়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে।

৩. সম্পর্কিত বিষয় পরিচিতি :

ক) ক্রুগ মিশন : ১৯৫৪-৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যার পর জাতিসংঘের সুপারিশে পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়, যা ক্রুগ মিশন নামে খ্যাত। ক্রুগ মিশন এ অঞ্চলের বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য একটা সুপারিশ পেশ করে।

খ) অষ্টমাসী বাঁধ : গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিলে ফসল করার উদ্দেশ্যে বাঁধ দিয়ে নোনা পানি ঠেকিয়ে আবাদ করতেন। আবাদ শেষে বাঁধ কেটে জোয়ারের পলিযুক্ত পানি বিলে তুলে বিল উঁচু করতেন। এভাবে চলত ফসল উৎপাদনের সাথে ভূমি গঠন। আর এই বাঁধের নাম অষ্টমাসী বাঁধ। মাঘী পূর্ণিমায় বাঁধ দিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় খুলে দেয়া হতো। এতে নদীর নাব্যতা বজায় থাকত। নদী দিয়ে পানি সহজে নিষ্কাশিত হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না।

গ) পোল্ডার : দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীবেষ্টিত ভূমির নদীতীর বরাবর চতুর্দিকে বাঁধ নির্মাণ করে নদীর লবণাক্ত পানি বিলে প্রবেশের পথ বন্ধ করা হয় এবং বিলের ভেতরে অবস্থিত খালের মুখে স্লুইস গেট নির্মাণ করে বিলের ভেতরের আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের পথ সুগম করা হয়, যা পোল্ডার নামে অভিহিত। ১৯৫৯ সালে সাবেক ইপি ওয়াপদা গঠন হওয়ার পর এই লবণপানি বাধা দেয়া এবং অধিক ফসল ফলানোর

জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

ঘ) জোয়ারাধার (TRM) : TRM এর পূর্ণরূপ Tidal River Management, বাংলায় নদীর জোয়ার ব্যবস্থাপনা। মূলত জলাবদ্ধতা নিরসন, ভূমি গঠন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের উদ্ভাবিত নদী পরিচর্যার সমন্বয়ে ফসল ফলানোর এক কৃষি পদ্ধতি, যা পরবর্তীতে গবেষকদের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্যাদা পেয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার-ভাটা চলমান মূল নদীসংলগ্ন যে কোনো উপযুক্ত বিলে তিন দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ দিয়ে নদীসংলগ্ন অবশিষ্ট দিকের উপযুক্ত স্থান উন্মুক্ত করে জোয়ার-ভাটা চালু রাখা। ফলে জোয়ারের সময় পলিযুক্ত পানি বিলে প্রবেশ করে পলি অবক্ষেপণ করবে। এই প্রক্রিয়ায় বিল উঁচু এবং নদী খননকাজ সম্পন্ন হয়। এতে ভূমি গঠন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং জলাবদ্ধতা দূর হবে।

ঙ) পেরিফেরিয়াল বাঁধ : একটা বিলে পরিকল্পিত জোয়ারাধার (টিআরএম) সৃষ্টির লক্ষ্যে তিন দিকে বাঁধ দেয়া এবং এক দিকে খোলা রেখে জোয়ারের সময় পলিযুক্ত পানি তোলা এবং ভাটিতে স্বচ্ছ পানি বের করে দেয়া। উদ্দেশ্য হলো পলিযুক্ত লবণপানি যাতে বাইরে না যায়। কারণ এই পানি বাইরে গেলে প্রাণী ও প্রকৃতির ক্ষতি সাধিত হবে। দ্বিতীয়ত পলিমাটি যা জমিতে পড়ে উঁচু হবে এবং স্বচ্ছ পানি বের হয়ে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করবে।

চ) কাটিং পয়েন্ট : পেরিফেরিয়াল বাঁধের যে দিকটা খোলা রাখা হবে, জোয়ারের পানি (পলিযুক্ত) বিলে প্রবেশ এবং পলিবিহীন স্বচ্ছ পানি বের করার জন্য সেই দিকটাকে কাটিং পয়েন্ট বলে।

৪. ভবদহ সংশ্লিষ্ট নদীপ্রবাহ (গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগর) : মুক্তেশ্বরী নদী ভৈরবের দক্ষিণমুখী শাখা। গঙ্গাবিধৌত বদ্বীপের এই প্রধান প্রবাহ ভৈরব। নদীয়া জেলার করিমপুর থানা দিয়ে মেহেরপুরের শোলমারী থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে প্রবহমান। গঙ্গা নদী এর প্রধান উৎস। পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ভারতের অভ্যন্তরে হাগনাগাড়ি নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে এই নদীর প্রবাহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়। চূর্ণী নদীর সাথে এই প্রবহের সংযোগ।

পদ্মার শাখা মাথাভাঙা ভৈরবের আরেক প্রবাহমুখ। উল্লেখ্য, ইংরেজরা মাথাভাঙা নদীর উৎপত্তিস্থলে মাটিবোঝাই নৌকা ডুবিয়ে মাটি ভরাট করায় এর স্রোত অনেকটা ক্ষীণ। মাথাভাঙা সুবলপুর-রঘুনাথপুরে ভৈরবের সাথে মিশে বুড়ি ভৈরব নামে গতিশীল গভীর নদী। কোটচাঁদপুরের তাহেরপুর-হাকিমপুর থেকে কপোতাক্ষ ভাগ হলে ভৈরব আবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বুকভরা বাঁওড় থেকে হালসার খাল কেটে হরিহরে মেশালে ভৈরব ও মুক্তেশ্বরীতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মুক্তেশ্বরীর উৎপত্তি ভৈরব থেকে। যশোর কালীগঞ্জ চৌগাছার বিস্তৃত এলাকার বিশাল বাঁওড় মজ্জাতের বাঁওড়ের বিপরীত পাশে মুক্তাধা নামক স্থান থেকে প্রবহমান ভৈরবের দক্ষিণ পাশ থেকে মুক্তেশ্বরীর উৎপত্তি। সুদীর্ঘ ও এককালের খরস্রোতা এখন মৃতপ্রায়। যশোর শহর ও ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ পাশ দিয়ে সতীঘটা মণিরামপুর উপজেলায় প্রবেশ করে। ঢাকুরিয়া পার হয়ে ডুমুর বিলের ভেতর দিয়ে সম্বনডাঙ্গা বিলের পাশ দিয়ে পাঁচবাড়িয়া মুক্তেশ্বরী কলেজ ও হাজিরহাট বাজারের উত্তর পাশ দিয়ে লেবুগাতী হয়ে বিল বোকড়ে প্রবেশ করে অভয়নগর ও মণিরামপুরের সীমানা বরাবর মশিয়াহাটী, কুল্টিয়াও লখাইডাঙ্গার পাশ দিয়ে বিল কেদারিয়ায় প্রবেশ করে। হেলারঘাট ও লখাইডাঙ্গার ব্রিজের নিচ দিয়ে এর অবস্থান। টেকার ব্রিজ পেরিয়ে ভবদহ সুইস গেটে টেকা নদী নামে এসে মিশেছে শ্রী ও হরি নদীর সাথে। অতীতে ভৈরব, হরিহর ও কপোতাক্ষের বহু মিলনধারার অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে আমডাঙ্গার খাল (২০০৬-এ নতুন করে স্বেচ্ছাশ্রমে কাটা) ছাড়া তার কোনো সংযোগ নেই।

ভবদহের ভাটিতে মুক্তেশ্বরী হরি নদী নামে খুলনার ডুমুরিয়া ও যশোরের কেশবপুরের সীমানা বরাবর প্রবহমান। নিচের অংশে তেলিগাতী নদী, গ্যাংরাইল ও শিবসা হয়ে কাঙ্গার সাথে সাগরে মিলেছে। হরিহরের নিম্নমুখী অন্য ধারাটি আপারসালতা হয়ে ঝপঝপি-য়া ও কাকবাছা নদীর দুই ধারা নিয়ে পশুর নদীর সাথে মিশে মালঞ্চের সাথে সাগরে মিলেছে।

মুক্তেশ্বরীর দুই পারে অসংখ্য গ্রাম ও হাটবাজার। যশোর শহরের পর (যশোর শহর মূলত ভৈরবের দুই পার) সতীঘাটা, ঢাকুরিয়া, উত্তরপাড়া, বারপাড়া, সুবলাকাঠি, ভোমরদহ, কাটাখালী, হাজরাইল, পাঁচবাড়িয়া, পাঁচকাটিয়া, কুমারসীমা, লেবুগাতী, ১৮ পাকিয়া, সুন্দলী, পোড়াডাঙ্গা, মশিয়াহাটী, কুলাটিয়া, লখাইডাঙ্গা, বালিধা, পাচাকড়ি, বারান্দী, দামুখালী, দত্তগাতি, ভবদহের পরে কপালিয়া, মান্দ্রা, দহাকুলা, শোলগাতিয়া, আগরহাটি, ভায়না, খর্নিয়া, শোভনা প্রভৃতি।

৫. 'ভবদহের জলাবদ্ধতা আর সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের গতিপথের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য'

বাংলাদেশের উজানে হিমালয় আর ভাটিতে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তো বটেই, এর মাঝখানের প্রায় সমগ্র ভূভাগ জলরাশি/নিম্নভূমি থেকে নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। বলা যায় নদীর বুক থেকে এবং নদীবাহিত পলি দ্বারা এই ভূখণ্ডের জন্ম, আর এ অর্থে নদী হলো জননী। তাইতো বলি, আমরা নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ। নদীসমূহের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ভূমি গঠন এবং প্রকৃতির নিয়মে জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখে। এর ব্যত্যয়ে মানুষ এবং প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের উৎপত্তি ও গতিপথ বিশ্লেষণ দরকার। আমরা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে দেখি, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ মূলত ভৈরব-মাথাভাঙা নদী কাঠামোরই অংশ।

৬. জলাবদ্ধতার কারণ জানতে যে বিষয়গুলো ভাবা দরকার :

ক) জলাবদ্ধতার জনক উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প : পূর্ব বাংলায় বন্যা সমস্যার সমাধানের দায়িত্বে নিযুক্ত হয় ওয়াপদা সংস্থা। ওয়াপদা পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যা তদন্তপূর্বক লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশকে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। সর্বোপরি গত শতাব্দীর ষাটের দশকে সাম্রাজ্যবাদীরা সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক বিক্রিতে বিশ্ববাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে, সবুজ বিপ্লবের নামে অধিক শস্য ফলাও শ্লোগানকে সামনে নিয়ে আসে। জোয়ারের লবণপানি প্রতিরোধে উপকূলজুড়ে বেড়িবাঁধ এবং স্লুইস গেট প্রকল্পের ফর্মুলা উপস্থিত করে। এই ফর্মুলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০-৬৭ সালের মধ্যে শুধু খুলনা অঞ্চলে ৩৪টি পোল্ডার ১৫৬৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ও ২৮২টি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। উপকূলজুড়ে এই পোল্ডার বেড়িবাঁধ আর স্লুইস গেট নির্মাণের ফলে বিল অভ্যন্তরে নোনা পানি প্রবেশ বন্ধ হয়। সবুজ বিপ্লবের স্লোগানে কৃষি উৎপাদন কিছুটা বাড়ে। শুরু হয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। জোয়ারের পানির সাথে সাথে আগত পলিও বিলের ভেতর প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় পোল্ডারের ভেতরের নিচু

টেবিল ১: নদনদীসমূহ এবং এদের উৎপত্তিস্থল

উৎপত্তিস্থল	নদনদী/নদনদীসমূহ
ভৈরব ও মাথাভাঙা	ইছামতী, বেত্রাবতী (বেতনা), কপোতাক্ষ, হরিহর, মুক্তেশ্বরী, ভদ্রা, চিত্রা, বেগবতী, ফটকী, কাজলা, নবগঙ্গা
তাহিরপুর, চৌগাছা, যশোর	কপোতাক্ষ-ভৈরবের শাখা
ঝিকরগাছা, যশোর	হরিহর-কপোতাক্ষের শাখা
ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোর	ভদ্রা-কপোতাক্ষের শাখা
মহেশ্বপুর, ঝিনাইদহ	বেত্রাবতী-ভৈরবের শাখা
কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, যশোর সদর ও চৌগাছা উপজেলা সংলগ্ন মজ্জাতের বাঁওড়ের দক্ষিণ প্রান্ত	মুক্তেশ্বরী-ভৈরবের শাখা
দর্শনা	চিত্রা ভৈরবের শাখা
মথুরাপুর, ঝিনাইদহ	বেগবতী/ফটকী নদী, নবগঙ্গার শাখা
চুয়াডাঙ্গা শহরের পাশে মাথাভাঙা	নবগঙ্গা
ভৈরব, কপোতাক্ষ, মুক্তেশ্বরী ইত্যাদির নিম্নপ্রবাহ	খোলপেটুয়া, আড়পাঙ্গাসিয়া, শিবসা, মরিচ, হরি, শ্রী, গ্যাংরাইল, শোলমারী, ময়ূর

উপরোক্ত নদীসমূহের জলপ্রবাহ যদি বাধাহীন থাকে তাহলে ভবদহসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে না। নদীসমূহের প্রবাহহীনতাই আজকের জলাবদ্ধতার মৌলিক বিষয়।

জমির ভূমি গঠন প্রক্রিয়া। এই পলি প্লাবন ভূমি না পেয়ে জমা হতে থাকে নদীর তলদেশে। অন্যদিকে উজানের জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উজান থেকে প্রবহমান নদীসমূহ প্রবাহহীন হয়ে পড়ে। ফলে লবণপানির প্রবাহ এবং পলিপ্রবাহ উজানে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে পড়ে, শুরু হয় পরিবেশ বিপর্যয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক নদীর তলদেশ, বিলের তলদেশের তুলনায় উঁচু হয়ে যায় নিষ্কাশনপথ বন্ধ এবং নেতিবাচক পথ ধরে সময়ান্তে জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে ভবদহসহ তৎসংলগ্ন অঞ্চল।

খ) বাধাগ্রস্ত উজানের প্রবাহ :

এক : গঙ্গাবিধৌত বদ্বীপের এ অংশের প্রধান প্রবাহ ভৈরব। পদ্মার শাখা মাথাভাঙা ভৈরবের আরেক প্রবাহমুখ। মাথাভাঙা সুবলপুর রঘুনাথপুরে ভৈরবের সাথে মিশে বুড়ি ভৈরব নামে গতিশীল গভীর নদী। কোটচাঁদপুরের তাহেরপুর হাকিমপুর থেকে কপোতাক্ষে ভাগ হলে ভৈরব আবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ফলে এর ভাটিতে মুক্তেশ্বরী তার দুর্বল প্রবাহ নিয়ে টেকা শ্রীহরি গ্যাংরাইল নামে বঙ্গোপসাগরের অভিমুখে প্রবাহিত। এর দুর্বল প্রবাহ ভবদহ অঞ্চলের পানিপ্রবাহের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সমর্থ নয়।

দুই : অবকাঠামো নির্মাণে নদীর ওপর হস্তক্ষেপ : ১৮৫৯ সালে আসাম-বাংলা রেললাইনের কাজ শুরু হয়। ১৮৬১ সালে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ১৭০ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়। রেললাইনটি স্থাপন করা হয় চিত্রা নদীর পূর্ব তীর বরাবর। এসময় চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভৈরব নদের ওপর একটি সংকীর্ণ রেল সেতু নির্মাণ করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালে চিত্রার খাত পুরোপুরি ভরাট করে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকল নির্মাণ করা হয়। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব নদনদীতে গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর পরও দর্শনার রেল সেতুর নিচ দিয়ে সামান্য পরিমাণ পানি আসত। কিন্তু ১৯৬০ সালে জিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মাগুরায় নবগঙ্গা নদীর ওপর একটি স্লুইস গেট নির্মাণের কারণে তা-ও বন্ধ হয়ে যায়।

৭. সমস্যা যেভাবে শুরু : আশির দশকের শুরুতে স্লুইস গেটের বাইরে পলি জমে বাঁধের বাইরের নদী ভেতরের নদী ও ভূমি থেকে উঁচু হয়ে যায়। নাব্যতা হারায় মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী ও হরি নদী। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পানি নিষ্কাশনের পথ। বৃষ্টির পানি আটকা পড়ে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। ১৯৮৪ সাল থেকে এই জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করে। বৃষ্টির পানি বিলে আটকা পড়ে পরে তা উপচে বিলসংলগ্ন গ্রামগুলো প্লাবিত হয়। পানিবন্দি হয়ে পড়ে মানুষ। পানি সরানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করে ভুক্তভোগী মানুষ। আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার ১৯৯৪ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ২৫৭ কোটি আর্থিক সহায়তায় শুরু করে খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (কেজেডিআরপি)। ২০০২ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। শ্রী, হরি ও টেকা নদীর পলি অপসারণ, খাল খনন এবং বিল কেদারিয়ায় জোয়ারাধার নির্মাণ করা হয় এই প্রকল্পের আওতায়। আপাত অবসান হয় জলাবদ্ধতার।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় বিএনপি নেতা বর্তমানে মণিরামপুর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজমুস সাদাতসহ আরও ৪৮৩ ব্যক্তি বিল কেদারিয়ায় জোয়ারাধার বন্ধের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড মার্চ মাস থেকে ৪৮ দিন ভবদহ স্লুইস গেট বন্ধ রাখে। এতে পলি জমে নদীর বুক উঁচু হয়ে পড়ে। ওই বছরের অক্টোবর মাসের টানা বর্ষণে পুনরায় পানি জমে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এরপর ২০০৬ সালের চার দফা অতিবর্ষণে অভয়নগর, মণিরামপুর, কেশবপুর ও যশোর সদর উপজেলার ২১টি ইউনিয়নের ১৮৪টি গ্রাম তলিয়ে যায়। পানিবন্দি হয়ে পড়ে চার লক্ষাধিক মানুষ। পানি সরানোর দাবিতে ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। তীব্র আন্দোলনের মুখে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ওই বছর ৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্রী, হরি ও টেকা নদী পুনঃখনন করা হয়। কেশবপুর উপজেলার বিল খুকশিয়ায় জোয়ারাধার চালু এবং অভয়নগর উপজেলার আমডাঙ্গা খাল সংস্কার করা হয়। শুরু হয় পানি নিষ্কাশন। দূর হয় জলাবদ্ধতা।

এই ফর্মুলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০-৬৭ সালের মধ্যে শুধু খুলনা অঞ্চলে ৩৪টি পোল্ডার ১৫৬৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ও ২৮২টি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। উপকূলজুড়ে এই পোল্ডার বেড়িবাঁধ আর স্লুইস গেট নির্মাণের ফলে বিল অভ্যন্তরে নোনা পানি প্রবেশ বন্ধ হয়। সবুজ বিপ্লবের সোগানে কৃষি উৎপাদন কিছুটা বাড়ে। শুরু হয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। জোয়ারের পানির সাথে সাথে আগত পলিও বিলের ভেতর প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হয়। বন্ধ হয়ে যায় পোল্ডারের ভেতরের নিচু জমির ভূমি গঠন প্রক্রিয়া। এই পলি প্লাবন ভূমি না পেয়ে জমা হতে থাকে নদীর তলদেশে। অন্যদিকে উজানের জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উজান থেকে প্রবহমান নদীসমূহ প্রবাহহীন হয়ে পড়ে।

৮. ভবদহের জলাবদ্ধ এলাকার মানচিত্র :

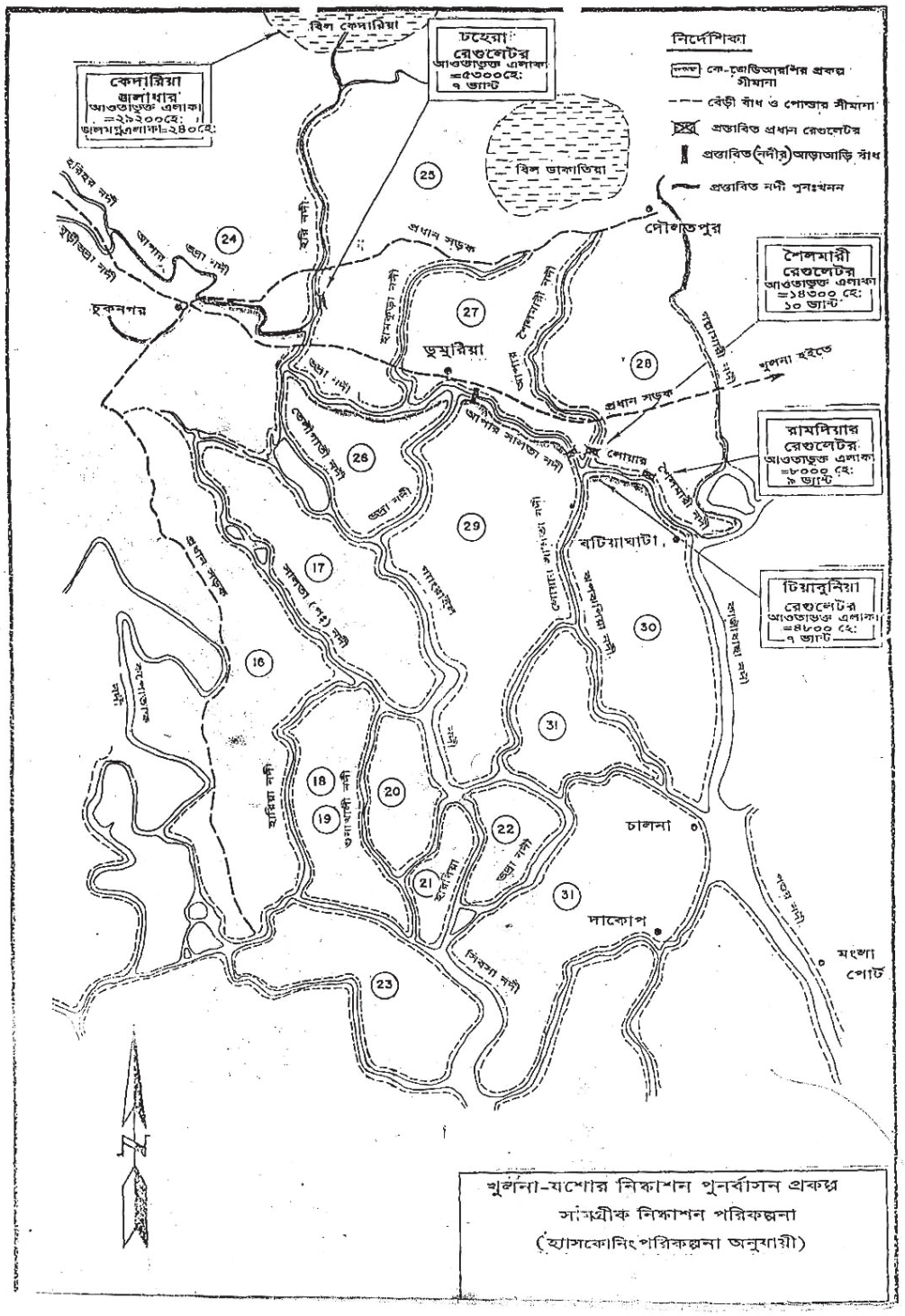

৯. ভবদহসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম : TRM (Tidal River Management) মূলত মূল নদীসংলগ্ন যে কোনো একটি নির্বাচিত (একাধিকও হতে পারে) বিলের তিন দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ করে (উন্মুক্তও হতে পারে) অবশিষ্ট দিকের বেড়িবাঁধের একটি অংশ উন্মুক্ত করে পরিকল্পিতভাবে বিলে জোয়ার-ভাটা চালু করা হয়। এটাই টিআরএম বা জোয়ারাধার নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে সাগর থেকে জোয়ারের সাথে আসা পলি বিলে থেকে যায়। পরে স্বচ্ছ পানি ভাটি আকারে ফিরে যায়। ফলে জোয়ারে

আসা পলি বিল/নিম্নভূমি উঁচু করে আর ফিরে যাওয়া স্বচ্ছ পানির প্রবাহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করে প্রকৃতির নিয়মে নদী খনন কাজ চলে। এভাবে ভূমি গঠন, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং নদী খনন কাজ সম্পন্ন হয়।

ক) অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের সমীক্ষা : ইতিহাস পর্যালোচনা হতে দেখা যায়, ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গ বিপর্যয়কারী বন্যায় কবলিত হয়। সেই সময়ের বিদ্যমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁর সেই সমীক্ষায় বন্যার কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। এই সমীক্ষায় ওই বন্যার প্রবণতা, বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাঁধের কার্যকারিতা সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা ছিল। প্রায় ১০০ বছর আগে ১৯২৭ সালে তিনি বললেন, "উত্তরবঙ্গের বন্যার প্রধান কারণ হচ্ছে সেখানকার বিলসহ নিচু এলাকায় পানি ঢুকলে সহজে বের হতে পারে না। বন্যার প্রবাহকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পন্থা।" প্রশান্ত মহলানবীশ তাঁর বিশ্লেষণ আরো বলেন, পলিযুক্ত পানি অবাধে চলতে দিলে পলির স্তর পড়ে নিচু ভূমি ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠবে, বন্যার প্রকোপ কমবে। এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ, সে কারণে নিকট ভবিষ্যতে বন্যা হতে থাকবে। সমাধান সূত্রে তিনি বললেন, নদীর তীরে বাঁধ তৈরি করে বন্যাকে ঠেকানোর প্রচেষ্টা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। কারণ তাতে আবদ্ধ বন্যার জলে সঞ্চিত পলিমাটি পড়ে নদীতল ক্রমশ ভরাট ও উঁচু হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিচু এলাকায় চারদিকে বাঁধ নির্মাণ দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়, বরং দীর্ঘ মেয়াদে জল নিষ্কাশনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের তথ্য (উত্তরবঙ্গে বন্যা সম্পর্কিত) আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার কারণ ও সমাধানের সাথে অনেকটা সংগতিপূর্ণ।

খ) টিআরএমের স্বীকৃতি : আসলে অতি প্রাচীন লোকজ জ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ টিআরএম। হ্যাঁ, গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা শুরু হলে তা নিরসনের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ (এই আন্দোলনের প্রায় সবগুলোর পুরোধা ছিল বাম প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যক্তি) বাঁধ কাটা, গেট ভাঙা, অবাধ পানি প্রবাহের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে এডিবি-ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (২২,৮৬৮,১৬ লাখ টাকা) কেজেডিআরপির (Khulna Jessor Drainage and Rehabilitation Project) অধীন হ্যাসকোনিং ও হেলক্রো সামগ্রিক নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই কর্মসূচির আলোকে পানি উন্নয়ন বোর্ড সাবেক উপকূলীয় বাঁধের সম্প্রসারণ করতে চাইলে গণপ্রতিরোধে তা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইজিআইএসের জাতীয় কর্মশালায় পানি বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ সকল স্তরের জনগণ গবেষণালব্ধ চারটি বিকল্পের মধ্যে চতুর্থ নম্বরের নদীর পরিকল্পিত জোয়ার-ভাটা ব্যবস্থাপনা, যা বর্তমানে টিআরএমের স্বীকৃতি দেয়।

গ) এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন/চলমান টিআরএমের খতিয়ান (টেবিল ২):

টেবিল ২: বাস্তবায়িত/চলমান টিআরএমের খতিয়ান

বিলের নাম	সংশ্লিষ্ট নদনদী	ধরণ (মুক্ত/পরিকল্পিত)	সময়কাল	কততম	উদ্যোক্তা	ক্ষতিপূরণ	প্রধান অন্তরায়/ পরিবেশের ওপর প্রভাব	মূল্যায়ন
ভরত-ভায়না	হরি নদী	অপরিকল্পিত, উন্মুক্ত	১৯৯৭, ২৯ অক্টোবর থেকে ২০০১	১ম	আন্দোলনকারী স্থানীয় জনগণ	ব্যবস্থা ছিল না	গাছপালা, মাছ, প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি। লবণাক্ততার ফলে গোখাদ্যের সংকট	বিলের তলদেশ ৫-৬ ফুট ভরাট, ৭৫% ভরাট, হরি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পায়।
বিল কেদারিয়া (৬০০ হেক্টর)	হরি নদী	পরিকল্পিত (৬০০ হেক্টর জমির চারদিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ ছিল)	জানুয়ারি ২০০২ থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত	২য়	পানি উন্নয়ন বোর্ড	ব্যবস্থা ছিল না	পরিবেশের ওপর তেমন বিরূপ প্রভাব ছিল না। ২০০৫ সালে উঁচু অংশের জমির মালিকরা জমির চাষ করে, নিচু অংশ নিচু থেকে যায়। আরও কিছুদিন টিআরএম দরকার ছিল, কিন্তু হয়নি। ২/৩ অংশ ভরাট হয়। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সামগ্রিক ক্ষতি ভবদহ অঞ্চলের নদী ১৭ কিলোমিটার পলি দ্বারা ভরাট হয়। ফলে ২০০৫ সালে জলাবদ্ধতা হয়।	হরি নদীর নাব্যতা বজায় ছিল।
পূর্ব বিল খুকশিয়া (৮৪৬ হেক্টর)	হরি নদী	পরিকল্পিত	২৭ এপ্রিল ২০০৬ থেকে ২০১০+	৩য়	পানি উন্নয়ন বোর্ড	ব্যবস্থা ছিল	ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সবাই পায়নি। ১০৮২ জন জমির মালিকের মধ্যে ৪৪৬ জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৮৫,২৩,৩৩২ (এক কোটি পঁচাশি লাখ তেইশ হাজার তিনশ বত্রিশ) টাকা মাত্র। (পানি উন্নয়ন বোর্ড ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,৪০,০০,০০০ (তিন কোটি চল্লিশ লাখ) টাকা বরাদ্দ করে।	নির্ধারিত সময়ে টিআরএম কার্যক্রম শেষ না হওয়ায় জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম হয়। টিআরএম করাকালীন সংশ্লিষ্ট বিলে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া দরকার।

ঘ) টিআরএম-পূর্ব বাঁধ কাটা/ভাঙা কার্যক্রম (বিক্ষুব্ধ জনতা/ আন্দোলনকারী সংগঠন)

টেবিল ৩: বাঁধ কাটা/ভাঙা কার্যক্রম

সময়	বিল	কার্যক্রম
১৯৮৩	ভর্তের বিল/সিঙ্গিয়ার বিল	বাঁধ ভাঙা
২২ জুলাই ১৯৮৮	ডহুরী	বাঁধ কাটা
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০	বিল ডাকাতিয়া	বাঁধ কাটা
২৯ অক্টোবর ১৯৯৭	ভরত-ভায়না	বাঁধ কাটা

ঙ) টিআরএমের ব্যর্থতার কারণ–

১। রাজনৈতিক হীন স্বার্থ (টিআরএমের পক্ষে-বিপক্ষে পাল্টাপাল্টি অবস্থান)

২। খাস জমি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা

৩। টিআরএমের বিরুদ্ধে ঘের মালিক ও লিজ গ্রহীতাদের অবস্থান

৪। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি এবং বোর্ডের প্রতি জনগণের অনাস্থা

৫। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব

৬। পেরিফেরিয়াল এবং গ্রাম রক্ষা বাঁধ সংক্রান্ত প্রশ্ন ইত্যাদি

৭। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্তিতে ব্যাপক হয়রানি, অব্যবস্থাপনা এবং সীমাহীন দুর্নীতি।

১০. ভবদহের চলতি জলাবদ্ধতায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব (টেবিল ৪-৭) :

টেবিল ৬

ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান				ক্ষতিগ্রস্ত মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	মাদ্রাসা	কলেজ	
০১ কি.মি.	৫১টি	৩৬টি	০৮টি	০৬টি	১০১টি
-	২৭টি	০৮টি	০৩টি	০২টি	৪০টি
	৭০টি	৪০টি	৩০টি	০৮টি	১৪৮টি

টেবিল ৭

ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (গভীর/ অগভীর)	ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার		ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি ক্লিনিক	মৃতের সংখ্যা
		পুকুর	ঘের/ বাঁওড়/ হ্যাচারি (হেক্টর)		
১২০টি	১৮,০০০	৬,০০০	২,৫০০	০৮টি	০৭ জন
৫০টি	৪,০০০	৪,৫০০	৩,৫০০	-	১২ জন
২০৮টি	৯৮৩	১,১১৩	২,৯৪৭		৩ জন

টেবিল ৪

উপজেলার নাম	মোট ইউপির সংখ্যা	অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নের নাম ও সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গকি.মি.)	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ/আংশিক)
মণিরামপুর	১৭টি	ঢাকুরিয়া, হরিদাসকাঠি, খেদাপাড়া, হরিহরনগর, ঝাপা, মশ্বিমনগর, চালুয়াহাটি, শ্যামকুড়, খানপুর, দূর্বাডাঙ্গা, কুলটিয়া, নেহালপুর, মনোহরপুর = ১৩টি	১২০টি	২০৬.০০	৩০,০০০	১,২০,০০০	১,৫০০
অভয়নগর	০৮টি	প্রেমবাগ, সুন্দলী, চলশিয়া, পায়রা = ৪টি পৌর = ১টি	৫৫টি	১২০.০০	১৪,৮৯৫	৬৫,০০০	১৪,৮৯৫
কেশবপুর	১১টি	কেশবপুর সদর = ১টি পৌর = ১টি	৮৫টি	১২১.৯০	১৭,৩৪৯	৮২,৫১১	১৭,৩৪৯

টেবিল ৫

অস্থায়ী/স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত পরিবার	ফসলের ক্ষয়ক্ষতি			ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যসম্পদ		ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান		ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক (পাকা/কাঁচা)
		সম্পূর্ণ (হেক্টর)	আংশিক (হেক্টর)	টাকায় ক্ষতি	হেক্টর	টাকায় ক্ষতি	মসজিদ	মন্দির/শ্মশান	
৪২টি	৪,০০০টি	৪,১৫২.০০	৬,৫৩৭.০০	৬৭৬.৩৫ কোটি	৭০১৩	১৯৪.০০ কোটি	২৪টি	০৮টি	৪৫ কি.মি.
২৬টি	৭২০টি	৫,৭৫৩.০০	-	৬০.৬৫ কোটি	৩৫০০	১২৪.০০ কোটি	১১টি	২০টি	৩৩ কি.মি.
২০টি	২,৩২৯টি	৫,৩০০	৩৯৪				৩০টি	১০টি	৪৪.৪৬ কি.মি.

১১. জলাবদ্ধ এলাকায় চলমান আর্থ-সামাজিক সংকট ও অভিঘাত :

সংকট	অভিঘাত
স্যানিটেশন ব্যবস্থা নষ্ট	দূষণের বিস্তার
পচনশীল জল	চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব
জলাবদ্ধ বসতভিটা	সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের আক্রমণ
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ	পানীয় জলের সংকট
গোখাদ্যের অভাব	গবাদি পশু কম মূল্যে বিক্রি/স্থানান্তর
জলাবদ্ধ কমিউনিটি ক্লিনিক	চিকিৎসার সমস্যা
বন্ধ স্কুল, কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	ঝরে পড়ার আশঙ্কা
দীর্ঘমেয়াদি জল	ইরি-বোরো চাষের অনিশ্চয়তা
কৃষিজ ফসল (ধান, পাট, শাক-সবজি আবাদ নষ্ট)	পেশার পরিবর্তন
জলাবদ্ধতা নিরসনের উদ্যোগ	দুর্নীতির মহোৎসব
ত্রাণ বিতরণ (যৎসামান্য)	সুদখোর বেসরকারি সংস্থার অনুপ্রবেশ
হাইওয়ে রাস্তায় জল ও জলযান (খুলনা-যশোর, নওয়াপাড়া-মণিরামপুর, নওয়াপাড়া-মশিয়হাটী)	পরিবহন ও যোগাযোগ সংকট, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, দীর্ঘমেয়াদি ভোগান্তির আশঙ্কা
উন্মুক্ত (জল, জলা, জলজ সম্পদ)	জলজ সম্পদ (মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি), খাসজমির দখলদার, বড় ভূস্বামীদের পুনর্দখল
কারেন্ট জালের বিস্তার	জলজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত
বনজ সম্পদ ধ্বংস	পরিবেশ বিপর্যয়
গবাদি পশু, মানুষ, খাবার ঘর যৌথ (রাস্তার ওপর)	দুর্বল আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন
জ্বালানি সংকট	খাদ্যের অনিশ্চয়তা
কর্মহীনতা	হাহাকার
বসতভিটাসহ শেষ সম্বল নষ্ট	শহরমুখী প্রবণতা, বস্তিয়ায়নের আশঙ্কা

১২. আশু করণীয় :

১। চলমান স্কেভেটরের কার্যক্রমে গতি আনয়ন
২। নতুন করে অধিক স্কেভেটরের ব্যবস্থা করা
৩। স্কেভেটর বন্ধ না রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা
৪। উত্তোলনকৃত পলি তীরে না রেখে দূরে অপসারণের ব্যবস্থা, ফলে পুনরায় নদীতে গড়িয়ে পড়ার হার কমবে
৫। ভবদহের ২১ ও ৯ গেটের মাঝ দিয়ে ভবদহের উজান ও ভাটির সরাসরি সংযোগ স্থাপন
৬। আমডাঙ্গা খালের সংস্কার
৭। নিহালপুরের দাইয়ের খাল সংস্কার
৮। মণিরামপুরের দূর্বাডাঙ্গার বাকার খাল সংস্কার
৯। উভয় পাশের জলপ্রবাহ সংযোগের যে পুল-ব্রিজ ছিল তার উভয় পাশের প্রবাহ নিশ্চিত করা
১০। বিল অভ্যন্তরের নিষ্কাশন খালসমূহ বাধাহীন করা।

১৩. স্থায়ী সমাধান/সুপারিশ/যা ভাবতে হবে :

প্রকৃতপক্ষে ভবদহের জলাবদ্ধতার সমাধান একক কোনো পদ্ধতি বা কৌশলে সম্ভব নয়। মূলত টিআরএম এবং বাধাহীন উজানের জলপ্রবাহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট আর যা যা ভাবা যেতে পারে তা নিম্নরূপ :

১। পরিকল্পিত এবং সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে পর্যায়ক্রমে এলাকার সকল বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন করা
২। টিআরএম নিরবচ্ছিন্ন করা। মূলত একটা টিআরএম শেষ না হতেই অন্যত্র তা চালু করার ব্যবস্থা করা। এক দিনও টিআরএমবিহীন পথচলা নয়
৩। আমডাঙ্গা খাল সংস্কারের মাধ্যমে সংকটের সহায়ক নিষ্কাশন পথ তৈরি করা
৪। মাথাভাঙা, ভৈরবের সাথে মুক্তেশ্বরী, কপোতাক্ষসহ ভাটির সব নদীর অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির নিশ্চিত ব্যবস্থাপনা
৫। জলাবদ্ধ এলাকা ঘিরে জলপ্রবাহ সার্কেল তৈরি করা। সংশ্লিষ্ট সকল নদী, খাল সংস্কার (কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক উপায়ে) এবং পরস্পরের মধ্যে জীবন্ত সংযোগ স্থাপন
৬। কৃত্রিম সব বাঁধ, বাধা অপসারণ। প্রাচীন সেই নিয়মে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া
৭। মৌলিকভাবে ভূমি-কৃষি, জল-জলা সংস্কার (টিআরএম চলাকালীন সংশ্লিষ্ট বিলে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম)
৮। নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে জলপ্রবাহ পরিকল্পিত করা
৯। উজানে ব্যারাজ নির্মাণ করে নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহ (যদিও প্রশ্নসাপেক্ষ)
১০। উজানের জলপ্রবাহ পর্যাপ্ত এবং নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের প্রশ্নে জাতীয় নীতি নির্ধারণ কার্যক্রম পরিচালনা
১১। ভবদহ, কাটেঙ্গা, জামিরা, বিল ডাকাতিয়া, আফিল জুটমিল এবং জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্টের মাঝ বরাবর গিলাতলা সংলগ্ন ত্রিমোহনা (ভৈরব-মুজতখালী) সংযোগ চ্যানেল তৈরি
১২। পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বাস্তবমুখী জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং সঠিক বাস্তবায়ন
১৩। ভূমি, কৃষি, জলা সংস্কার
১৪। নদী, খাল-বিলে পরিকল্পিত ও অভিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করা।

১৪. উপসংহার : আমাদের উজানে হিমালয় আর ভাটিতে বঙ্গোপসাগর। মধ্যবর্তী পললভূমি আমাদের আবাসন। জলের মধ্যে, জলের খেলায় এই ভূখণ্ড এবং তার গঠন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে একেবারে নির্মূল করা আমাদের তাই অসম্ভব। ঝুঁকি কমানোর কৌশল বের করা সম্ভব মাত্র। সম্ভবত বাংলাদেশে ১২৩-১২৫টি পোল্ডার আছে। মূলত লবণাক্ততা, জোয়ার-ভাটা এবং জলোচ্ছ্বাস থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেই এর জন্ম। আর জলাবদ্ধতার গোড়ার কথাও এখানে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তো বটেই, পোল্ডারভুক্ত প্রায় সর্বত্র এই জলাবদ্ধতার সংকট বিদ্যমান। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে আলোচিত ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সংকটের উত্থান, আশির দশকের বিকাশ আর সম্প্রতি এর চরম পরিণতি। হ্যাঁ, প্রতিবছর মোটামুটি ২৪০ কোটি টন পলি এই ভূখণ্ডে উজান ও ভাটি থেকে প্রবাহিত ও নিপতিত হয়। অবশ্য বাংলাদেশে রেইন কাট পলির বিষয়টি ভাবলে বলা যায়, বন্যা ও বৃষ্টির তারতম্যে এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এর ব্যবস্থাপনা মুখ্য বিষয়। প্রকৃতির কাছে ফিরে গিয়ে প্রকৃতির নিয়মে দিনে দুইবার (জোয়ার-ভাটা) প্লাবন ভূমিতে এই পলির বিক্ষেপণ যেমন ভূমি গঠন করবে, তেমনি স্বচ্ছ পানি ফেরার পথে নদীর প্রবাহ সচল রাখবে। এর ব্যত্যয়ে নদীর, খালের তলদেশ ভরাট হবে। এর প্রমাণ মাত্র দেড় মাসে ভবদহের স্লুইস গেটের ভাটিতে ১৫ কিলোমিটার পলি দ্বারা ভরাট হওয়া। এর বিকল্প কী? যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পলি ব্যবস্থাপনা নদীর সংস্কার, তা তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশে কতটুকু সম্ভব ভাববার বিষয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ মূলত দক্ষিণ-পূর্বমুখী আর এর পলি শতভাগ মিহি প্রায় কাদাযুক্ত (উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নদী দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী এবং তার পলি খসখসে পাথরকুচিযুক্ত)। প্রাকৃতিক নিয়মে এর অপসারণের জন্য জলপ্রবাহ বেগবান হওয়া জরুরি। গতি ঘণ্টায় ন্যূনতম তিন কিলোমিটার। উজানের প্রবাহ বন্ধ থাকায় এটা ব্যাহত। সেটি আরেকটা বড় প্রশ্ন। সংকট উত্তরণে টিআরএমই ভরসা। তবে এটা স্যালাইনসদৃশ, জীবন চলবে কিন্তু সুস্থ জীবন নয়। চূড়ান্ত সমাধানে শুধু দরকারই নয়, ভূমি-কৃষি, জল-জলা-জঙ্গলে মৌলিক ব্যবস্থাপনা এবং যৌক্তিক সংস্কার নিশ্চিত করা জরুরি। তার জন্য চাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। এর কোনো বিকল্প নেই।

মো. জাহাঙ্গীর আলম: প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, ফুলতলা, খুলনা
ইমেইল: jahangir252540@gmail.com